জাতীয় শিক্ষানীতি, নব্য শ্রেণিবিন্যাস ও অনলাইন পঠনপাঠন

ময়ূখ লাহিড়ী

সাম্প্রতিক অতীতে এক বহুলচর্চিত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি'। কারণ, এর মধ্যে কতটা 'জাতীয়' এবং কতটা 'নীতি' তা সত্যিই এক বড় প্রশ্ন। যার নেপথ্যে রয়েছে কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং মানুষকে তার সমাজ ও ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেওয়ার এক সুকৌশলী প্রয়াস।

১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী 'ইতিহাস' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিল। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে প্রথম লাইনেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র...ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না।" রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এবং নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায়, অতীতকাল থেকে ভারতের যে ইতিহাস আমরা পড়ে এসেছি তা মূলত আর্যাবর্তের ইতিহাস। গুটিকয়েক যুদ্ধ বাদ দিলে সেখানে দাক্ষিণাত্যের আলোচনা নেই। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদাকে বাদ দিলে উত্তর-পূর্ব ভারতের কথা ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য – কোথাওই নেই। অর্থাৎ, কয়েকশো বছর ধরে যে ইতিহাস আমরা পড়ে এসেছি তা এক আধিপত্যবাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা Dominant Paradigm-এর অনুগত হয়ে থেকেছে। স্বাভাবিকভাবেই, বাকি অংশের মানুষ, তাদের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি – সবেরই এক সচেতন প্রান্তিকীকরণ বা Marginalization হয়েছে। সুতরাং, ইতিহাসগতভাবেই 'শাসক'-এর তকমা পেয়েছে উত্তর ভারত। আর বাকি অংশ থেকে গিয়েছে এক অনুচ্চারিত শ্রেণি হিসাবে।

সাম্প্রতিক শিক্ষানীতি এই 'ঐতিহ্যের'-ই অনুসারী। যেখানে ভাষা এবং সংস্কৃতির অস্তিত্ব ঘোরতরভাবে বিপন্ন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'হিন্দুস্তান'-এর কথা। সাম্প্রতিক যে প্রচারমূলক কর্মসূচি 'শিক্ষানীতি'-র মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে তাতে 'হিন্দুস্তান'-এর সঙ্গে 'হিন্দি'-কে মিশিয়ে দেওয়ার এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা রয়েছে। রয়েছে হিন্দিকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দি বলে যে ভাষাটিকে আমরা জানি তা কিন্তু 'হিন্দুস্তানি' ভাষা নয়। কারণ, হিন্দুস্তানি ভাষার সঙ্গে অসংখ্য আরবী এবং উর্দু শব্দ মিশে রয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে আগ্রা অঞ্চলের কথ্য ভাষা এবং বারাণসী অঞ্চলের কথ্য ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাহলে 'হিন্দি' বলতে কি বোঝায়? আর কেন 'হিন্দুস্তান'-এ থাকতে গেলে সেই ভাষায় কথা বলা জরুরি? এই ভাষাগত Marginalization-এর জায়গা থেকেই দক্ষিণ ভারতের মানুষ হিন্দি ব্যবহারে চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, আরও এক শ্রেণিবিভাজন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য – দুই সমাজেই প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সমাজ গঠিত ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র শ্রেণি নিয়ে। মহাভারত এই শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের বেশকিছু ধারণা দেয়। যেমন দ্রোণাচার্য কখনই চাননি যে শূদ্র একলব্য ক্ষত্রিয় রাজপুত্র অর্জুনের

Society Language and Culture

সমকক্ষ হয়ে উঠুন। আবার বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। আবার পাশ্চাত্য সমাজে শ্রেণি বিভাজন ছিল ত্রিমুখী – রাজা, পোপ এবং সাধারণ মানুষ। কিন্তু মধ্যযুগীয় বর্বরতা গভীর প্রভাব ফেলেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেণি বিভাজনে। প্রাচ্য সমাজে কঠোর হয়েছিল শ্রেণিসচেতনতা। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য সমাজে শুরু হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ঘৃণ্য কর্মসূচি।

এই গোটা ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তিনটি ঘটনার মাধ্যমে। যা ঘটেছিল মাত্র ১১ বছরের মধ্যে। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে দেখিয়েছিলেন, কীভাবে পুঁজি এবং শোষণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন তৈরি হচ্ছে। এর পাঁচ বছর পর ১৮৫৩ সালে রাশিয়ায় জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটিয়েছিলেন। ইউরোপের মধ্যে তখনও পর্যন্ত কেবল রাশিয়াতেই ক্রীতদাস প্রথা ছিল। অর্থাৎ, রাশিয়া থেকে দাসপ্রথা অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা ইউরোপ থেকে তা মুছে গিয়েছিল। এর ছ'বছর পর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইনের 'ওরিজিন অফ স্পিশিজ'। যেখানে ডারউইন প্রমাণ করেছিলেন যে রাজা, পোপ, সাধারণ মানুষ সকলেই বাঁদরের বিবর্তিত রূপ। ডারউইনের আবিষ্কারকে যতই 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, এর সামাজিক প্রভাব এবং শ্রেণিবিভাজনকেন্দ্রীক প্রভাব ছিল অনেক বেশি। কারণ, প্রাচ্যে ডারউইনের তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পর বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিভাজনও যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছিল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল হিসাবে ভোগবাদী সমাজ গড়ে ওঠার পর জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান হয়ে উঠেছিল শ্রেণির নতুন Signifier। অর্থাৎ, 'ওরা বড়লোক, ওদের গাড়ি আছে', 'ওরা খুব গরীব, খেতে পায় না' জাতীয় ধারণা। বিশ্বায়িত সমাজে প্রযুক্তি 'কিনতে' পারা এবং 'ব্যবহার' করা শ্রেণিচেতনা এবং শ্রেণিবিভাজনের আর এক সূচক হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতেই অনলাইন ক্লাস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। অনলাইন ক্লাস, যা ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রযুক্তি 'কেনার' মতো সামর্থ্য ভারতের মতো আর্থিক কাঠামোয় কতজনের রয়েছে? কারণ, দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষ বাস করেন দারিদ্রসীমার নিচে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, 'দারিদ্রসীমা'-র আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা এবং ভারতীয় সংজ্ঞার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সেই ভারতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ীও ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন দেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ মানুষ। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে ৪৫ শতাংশ মানুষ বাস করেন দারিদ্রসীমার নিচে। এই মানুষদের বেশিরভাগই দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। যাঁদের কাছে স্মার্টফোন কেনা এক অলীক কল্পনার মতোই। অথচ এই অংশের মানুষের জন্যই সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও প্রকল্পের সফল রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। তাই নিয়ে আসতে হয়েছিল 'মিড-ডে মিল'-এর মতো 'লোভনীয়' কর্মসূচিও। এমন আর্থিক শ্রেণির মানুষের শিক্ষাও আজ অনলাইন ক্লাসের উপর নির্ভরশীল। শুধু স্মার্টফোনই কিন্তু যথেষ্ট নয় অনলাইন ক্লাস করার জন্য। সঙ্গে থাকা চাই মজবুত এবং অঢেল ইন্টারনেট সংযোগ। কারা কিনবেন সেই স্মার্টফোন? কারা নেবেন মজবুত ইন্টারনেট

Society Language and Culture

সংযোগ? যাঁদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকাই এক দুরূহ লড়াই? যাঁরা করোনা অতিমারীর দাপটে কাজ হারিয়েছেন? এখানেই শেষ নয়। ২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিবিসি-র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের অন্তত ২০ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি। যদিও ২০১৮ সালের মার্চ মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, ছ'লক্ষ গ্রামে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ভারতে কোনও গ্রামই আর বিদ্যুৎহীন অবস্থায় নেই। এই তথ্যকে সঠিক বলে ধরে নিলেও সমস্যা থাকছে 'বিদ্যুৎ সংযোগ'-এর সংজ্ঞা নিয়ে। কারণ, সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনও গ্রামের ১০ শতাংশ বাড়িতে যদি বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে তাহলেই তাকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ, সেই গ্রামের ৯০ শতাংশ বাড়িতে যদি বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকে তাহলেও তা বিদ্যুৎ সংযোগের তালিকার আওতাভুক্ত হবে! সুতরাং, যাঁরা স্মার্টফোন কিনবেন তাঁদের ফোন চার্জ দেওয়ার মতো ন্যূনতম সুবিধাটুকুও অনেকাংশে নেই। এই পরিকাঠামো নিয়েই হবে 'সর্বসাধারণের' জন্য 'অনলাইন' ক্লাস!

উন্নয়নশীল দেশের পরিকাঠামোকে যদি উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ধরে নিতে হয় তাহলে সেখানে প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ। যা সাধারণ মানুষকে সেই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ করে তুলবে; উন্নয়নের ফসল সকলের কাছে পৌঁছে দেবে। সেখানে ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা বেসরকারি সংস্থার উপর নির্ভরশীল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সংস্থাগুলি সরকারি মদতে Monopoly চালায়। সুতরাং, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে মেলবন্ধনের সম্ভাবনা যথেষ্ট ক্ষীণ।

তার উপর, ক্লাস অনলাইন হয়ে গেলে 'মিড-ডে মিল' ব্যবস্থার কোনও জায়গাই থাকছে না। ফলে, শুধুমাত্র সেই শ্রেণি, যারা বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত, যারা স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট কিনতে সক্ষম, তাদের মধ্যেই শিক্ষা সীমিত থাকছে। শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে উঠছে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষমতাভোগী শ্রেণির কুক্ষিগত। অতএব, সর্বশিক্ষা অভিযান অনলাইন ক্লাসের জমানায় সত্যিই কতটা সর্বসাধারণের উপযোগী হয়ে উঠবে তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন থাকছে।

করোনা যখন মানুষকে গৃহবন্দি থাকতে বাধ্য করছে তখন কীভাবে পঠনপাঠনের প্রক্রিয়াকে সচল রাখা যায় তা নিয়ে ভাবতে গিয়েই উঠে এসেছিল অনলাইন ক্লাসের দাওয়াই। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয়ে প্রায় সব মহলই একমত, 'ব্যক্তিগত পরিসর'-এ থাবা বসাচ্ছে ওয়েবক্যাম। যার জেরে অনেকটাই প্রকট হয়ে পড়ছে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক অবস্থা এবং অবস্থান। যা আরও একবার বে-আব্রু করে দিচ্ছে শ্রেণিবিভাজনকে। যে বিভাজনকে ঢাকার জন্যই 'ইউনিফর্ম' চালু করা হয়েছিল। ফলে, শুধুই যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া, নিম্নবর্গীয় মানুষই বঞ্চনার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নন, মধ্যবিত্ত শ্রেণিও পড়ছে এক চূড়ান্ত অস্বস্তিকর অবস্থায়। যে অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে তাদের অবস্থানের প্রতি স্কোয়্যার ফিটে, ব্র্যান্ডহীন পর্দায়, তুলো-বেরোনো সোফাসেটে, বাটা মাছ ভাজার ধোঁয়ায়, সেলাই-খোলা ফতুয়ায়, প্রযুক্তির বিড়ম্বনায়।

Society Language and Culture

আর্থিক সমস্যা যে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই তা নয়, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যে শিক্ষক/শিক্ষিকারা যুক্ত তাঁদের বেতনকাঠামোতেও রয়েছে সমস্যা। সিঙ্গাপুরের মতো প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষকের মতো আর্থ-সামাজিক বিভাজন নেই। ফলে সেখানে General Educational Officer শব্দবন্ধই সব শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ভারতের মতো দেশে প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের সবসময়ই কোনও এক আশ্চর্য কারণে প্রকৃত 'শিক্ষক'-এর মর্যাদা দেওয়া হয় না, যেন তাঁদের কাজটা অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষকদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। আরও এক শ্রেণিবিন্যাস।

এই পরিস্থিতিতেই শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। যেখানে শ্রেণির ধারণা শুধুই Economy এবং Ethnicity নির্ভর নয়। বরং অনেক বেশি প্রযুক্তি, তার উন্নতি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, যা আদতে সামাজিক অবস্থানের সূচক।

Society Language and Culture